দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 15 OCT 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

34

শৈশব থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু

হোসনে আরা শাহেদ

জীবনের সমস্যারও আবর্তন ঘটে। এই যেমন সংকট দেখা দিয়েছে কলেজে ভর্তির। এসএসসি পরীক্ষার বিজয় সাফল্যের একটি মাত্র ধাপ। পরের ধাপ কলেজে ভর্তি হতে পারার। অর্থাৎ এক স্তরে উত্তীর্ণ হলেই পরের স্তরের নিশ্চয়তা মেলে না। এখন সবই আলাদা আলাদা।

সবচেয়ে বড় কথা, এখন সবই পরীক্ষার ফিতায় মাপা। ছোট্ট শিশুটি পর্যন্ত স্কুলে ভর্তি হতে পারবে কি পারবে না বলে দেবে তার পরীক্ষা। পরীক্ষার সফলতার ওপর নির্ভর করবে তার ঐ ক্লাশে ভর্তি হতে পারা। প্রতিযোগিতার শুরু জীবনের ঐ অবুঝ কাল থেকে; না-বুঝেও তাকে হার মানতে হয়, তার বোধের আগেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এই প্রতিযোগিতা আগে ছিল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। ক্লাশ টপকানো আর চাকরি লাভের বেলা। এ ছাড়া ছিল জলপানি নিয়ে বাইরে যাওয়ার পালা। এখন এর ব্যাপ্তি ঘটেছে। প্রতিটি স্তরে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষা নামের পাগলা-ঘোড়াকে বশীভূত করে আনতে হবে। এটা বিধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিযোগিতার পরীক্ষার বিশেষত্ব হচ্ছে— এতে কেবল পাস হলেই চলে না, চলে না শুধু মান ভালো হলেই, এর জন্য দরকার তালিকার ওপরের দিকে বা নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে নাম থাকা।

এখানেই যতো অনিশ্চয়তা। এক-জন শিক্ষার্থীর ফলাফল সন্তোষজনক হলেও লাভ হয় না যদি না তার স্থান সংখ্যার মধ্যে না থাকে। এ কারণেই এ অনেকটা ভাগ্যের ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আর এ জন্যই শিক্ষার্থীকে নিয়ে অভিভাবকের হয়রানির পরিমাণ বেড়ে গেছে। একটি সন্তানকে চার পাঁচ জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা দেও-য়াতেই হয়। প্রয়োজনে ভর্তিও করিয়ে রাখতে হয় একাধিক কলেজে বা প্রতিষ্ঠানে। কাঙ্খিত প্রতিষ্ঠানে জায়গা হয়ে গেলেই অন্যত্র ভর্তি হয়ে টাকা গচ্ছার বেদনা ভুলে যাওয়া যায়।

যায় মানে যেতে হয়। কষ্টার্জিত কড়ি আর বড় কথা নয়, বড় হচ্ছে এখন ভর্তি, ভর্তি-হওয়া, ভর্তি হতে পারা। ভর্তির সুযোগই এখন শ্রেষ্ঠ যোগ, সেরা পাওয়া। ভর্তির এই দুর্যোগ আজ আর নতুন কিছু নয়, এ এখন গা-সওয়া।

এ থেকে কয়েকটি জিজ্ঞাসা বের হয়ে আসে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, নব-প্রজন্মকে যে এভাবে দুর্ভোগ উপহার দিচ্ছি, এর পরিণামটি কী? স্বাভাবিকভাবে তার শিক্ষার পথ যে বিকশিত নয়, এজন্য আমরাই দায়ী। তার মেধা, প্রতিভা, মননশীলতা, আশা আকাঙ্খা তার মতো করে সফল করার পথ সে পাচ্ছে না। তার প্রাপ্তির সঙ্গে চাহিদার মিল নেই, চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার। যে নির্মম প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা তার কাঁধে ভর করে স্তরে স্তরে, তার জন্য তার দায় নেই, অথচ তার যা তা সবই তাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। এমনও হয়, প্রভাব প্রতিপত্তিও অনেকটা টেনে নেয়, কিন্তু যার তা নেই, সে কি শুধু মেধা সম্বল করে পার পেতে পারছে? একজন দু'জন পারলেও সবাইর পক্ষে কি সম্ভব হচ্ছে?

জানা কথা, না। তাহলে জিজ্ঞাসা আবার জাগে অনভিজ্ঞ সুকোমল প্রাণে এমন ব্যর্থতার জন্য কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? এ প্রতিক্রিয়ার ফলও বা কেমন হতে পারে?

শিক্ষার্থীদের মধ্যে গরিষ্ঠসংখ্যক হতাশায় আক্রান্ত। পড়ছে হয়তো, পড়ছে কোনও না কোনো প্রতি-ষ্ঠানে--কিন্তু নিরুৎসাহী হয়ে থাকে যা চেয়েছে, পায়নি বলে। কেবল কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ভর্তির প্রশ্ন এ নয়, এ জটিলতা এর নিচে ও ওপরের স্তরেও সমানভাবে আছে। শিক্ষা গ্রহণের সময়ে এই অনিশ্চয়তা আত্ম-বিশ্বাস চুরমার করে শিক্ষার্থীর যে ক্ষতি করে, তা কোনক্রমেই পূরণের নয়। জীবনের গঠনের স্তরে মনের ভূমিকা প্রধান; মনের সঙ্গে সম্পর্ক পরিবেশের, অবস্থার। কারণ যাই হোক, মানসিক আঘাত একার-ণেই সুষ্ঠু বিকাশের প্রতিবন্ধক।

প্রতিকার কি বা কেমন হওয়া উচিত, এ নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু তাতে লাভ নেই। বাস্তব-নির্ভর প্রতিবিধান এ ক্ষণে কিছুটা অসম্ভবই। চট করে অজস্র নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলা যায়, কিন্তু কার্যত তা সহজ নয়। সীমিত সম্পদের এ দেশে একমাত্র পথ বোধ হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানের উত্তরণ অর্থাৎ প্রতিটি প্রতি-ষ্ঠানের মধ্যে মানের সমতা বিধানের জন্য সচেষ্ট হওয়া। এর ফলে নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চাহিদা কমে আসবে— শিক্ষার্থী ভর্তি হবে সুযোগ মতোন ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

'মান' বলতে বুঝবো অবশ্যই প্রাথমিকভাবে শিক্ষার মান। তবে এসঙ্গে পরিবেশের বিষয়টিও অঙ্গা-ঙীভাবে জড়িত। খেলাধুলা, পরি-চ্ছন্নতা, ক্যান্টিন, পাঠাগার সব মিলে যদি শিক্ষার্থীদের মন মানসিকতার দাবী মেটাতে সক্ষম হয় প্রতিষ্ঠান, তবেই তা উত্তম।

আর কিছু এ মুহূর্তে নগদানগদি সম্ভব না হোক, অন্তত এ দিকটা দেখা যায়। এক হিসাবে দেশে যে ক'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, প্রতিটি স্তরেই, তা-ও যদি যথাযথভাবে শিক্ষার্থী অভিভাবকের কাছে সন্তো-ষজনক করে তোলা যায়, সুরাহা কিছুটা হয়ই।

এখন প্রশ্ন— এখানে বাধাটা কোথায়? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমুন্নত ও সমান মানের করার প্রশ্নে অন্তরায়টা কি? মূল বিষয়ে বৈষম্য নেই, যেমন পাঠ্যসূচী, প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা পদ্ধতি। তবু এমন পার্থক্য কেন? পার্থক্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানে— যে মান নির্ভরশীল সার্বিক পরিবেশের ওপর। এই পরিবেশ (যেমন শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা, অধিক পাঠের সুযোগ থাকা, জ্ঞানচর্চা ও শরীর চর্চার পরিবেশ পাওয়া, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সহায়তা লাভ করা) আবার বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে আর্থিক সঙ্গতির ওপরে। যেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থায় দুই ধরনের প্রতিষ্ঠান বিরাজ করছে, সেহেতু সঙ্গতিরও তারতম্য ঘটছে।

এ কারণে যা জরুরী, তা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাগত ও পরিবেশগত বৈষম্যের অবসান ঘটা-নো। ভালোকেই মন চায়। শিক্ষার্থী মাত্রেরই নামী ও যশস্বী প্রতিষ্ঠানে পড়ার আগ্রহ অদম্য। এই প্রবণতা, এই যাচ্ঞা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত। বরং এই মননশীলতা ধরে রাখাই কল্যাণের, মঙ্গলের।

এ কথা মানা উচিত, আজকাল পুরোপুরি বেসরকারী বলতে যা বোঝায়, তেমন কোনও প্রতিষ্ঠানই নয়। শিক্ষক সম্প্রদায়ের বেতনের একটি ভালো অংশ সরকার থেকে দেওয়া হয়। আবর্তক মঞ্জুরীও কিছুটা পাওয়া যায়। তাহলে বেসরকারীদের সম্পর্কে না ভেবে উপায়।

স্থিরভাবে চাইলে প্রতিটি প্রতি-ষ্ঠানেরই উন্নয়ন সম্ভব। উন্নয়ন মানে দালান ভবনই নয়, উন্নতি মানে শিক্ষার গুণগত ও পরিবেশগত মানের উত্তরণ। এই উত্তরণ ভালো মেধাবী শিক্ষার্থী বেছে বেছে নিলেই আসবে না— শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো শিক্ষা-দানের ও আনুষঙ্গিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ জন্য দরকার প্রথমত সদিচ্ছা, দ্বিতীয়ত পরিকল্পনা। সর্বোপরি বাস্তবায়নের উদ্যোগ।

বৈষম্য জিইয়ে রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও শ্রেণী সৃষ্টি করা অসমীচীন, কেননা জীবনের এই স্তরে যে শ্রেষ্ঠ-ত্ববোধ অন্তরে জমা হয়, তা মানুষকে উন্নাসিক ও দর্পিত করে তোলে বলে সুনাগরিক তৈরির জন্য তা পরিপন্থী। শিক্ষা গ্রহণের কালে একতরফা সুবিধা পেয়ে পেয়ে তারা সুবিধাভোগী সত্তায় পরিণত হয়। এ মানসিকতায় অভিজাত শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করা যায়, অবহেলিত ও বঞ্চিত সম্প্র-দায়ের জন্য ভাবনা জাগানো সম্ভব নয়। দরিদ্র, শিক্ষা বঞ্চিত এ দেশে এমন মানসিকতার লালন করা আত্মঘাতী হওয়ারই নামান্তর।

এ কারণেই প্রয়োজন আছে আমাদের আজকের শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে সযত্ন হওয়ার। যে ছোট্ট গোষ্ঠী সকল লালিত্য লাভ করছে, তাদের মনে দেশের প্রতি বৈরিতাই জাগবে; যারা অর্থাৎ যে বিশাল গোষ্ঠী বঞ্চিত হচ্ছে, তারা কর্মজীবনেও অবহেলিত ও বঞ্চিত থাকবে। ফলে তাদের মধ্যেও বৈরাগ্য, নিস্পৃহতা, হতাশা জন্ম নেবে। এমনি করেই আগামী দিনে আমাদের নিঃস্ব হওয়ার আশংকা আছে।

সংকটের মানুষ দীপ্ত হতে পারে যদি তার ক্লিষ্টতা একদিন আশার আলো পায়, তাকে যোগ্যতর করে গড়ে তোলে; এমন অবস্থায় তার বা তাদের কাছে প্রত্যাশা করা চলে। কিন্তু যে সংকট কেবল হতাশাই দেয়, পথরুদ্ধ করে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, সে সংকটের মানুষ প্রাণ-চেতনা পায় না কোনও কালেই। তার ক্লেশ তাকে নিঃশেষ করে— দেশ ও জাতির জন্য বোঝায় পরিণত হয়ে পড়ে।

জাতির ভবিষ্যৎ যাদের ওপর নির্ভর করে, তাদের সম্পর্কে আর দেরী করার অবকাশ নেই। যাত্রা করা কর্তব্য আমাদের যা আছে, তা নিয়েই।